ইয়েমেনে দুর্ভিক্ষ বা জবরদস্তিমূলক অনাহারের কারণ অনুসন্ধান

সায়মা আহমেদ ও মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান

ইয়েমেনে সৌদী জোটের অবিরাম সামরিক আগ্রাসনে সেদেশের নাগরিকদের জীবনে নেমে এসেছে ভয়াবহ বিপর্যয়। একদিকে সশস্ত্র আক্রমণে ব্যাপক প্রাণহানি হচ্ছে, জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে অন্যদিকে অবরোধসহ নানা প্রতিবন্ধকতায় সৃষ্টি হচ্ছে খাদ্যাভাব ও খাবার ক্রয়ে অক্ষমতা। এই লেখায় এই অনাহারের প্রকৃতি, পটভূমি ও কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইয়েমেনের ইতিহাস, রাজনৈতিক জটিলতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

জবরদস্তিমূলক অনাহার একটি নতুন ধারণা আমাদের জন্য। সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়াগুলোসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে অনাহারী, জীর্ণ-শীর্ণ ইয়েমেনি শিশুদের ছবি একজন বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষের মানসিক চাপের জন্য যথেষ্ট। জাতিসংঘ ও সেভ দ্য চিলড্রেনের হিসাব অনুযায়ী, ইয়েমেনে গত তিন বছরে ৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ৮৫ হাজার শিশু অনাহারে সম্ভবত মারা গেছে।[১] আরো ১ কোটি ৪০ লাখ (১৪ মিলিয়ন) মানুষ আছে অনাহারে।[২] এটিকে জাতিসংঘ পৃথিবীর ইতিহাসে গত ১০০ বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।[৩] এটিকে কেউ কেউ বলছে 'জবরদস্তিমূলক অনাহার'। এ রকম পরিস্থিতিতে ইয়েমেনে দুর্ভিক্ষের কারণ জানতে চাওয়ার আগ্রহ স্বাভাবিক। কেনই বা ইয়েমেনের সাধারণ মানুষ এই জবরদস্তিমূলক অনাহারের শিকার হচ্ছে? মূলত এই প্রশ্নটির উত্তরই এই লেখাটিতে অনুসন্ধান করা হবে।

লেখাটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'জবরদস্তিমূলক অনাহার' ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনার নিরিখে ইয়েমেনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হবে। দ্বিতীয় ভাগে ইয়েমেনের জবরদস্তিমূলক অনাহারের কারণগুলো বিশেষণ করা হবে।

'জবরদস্তিমূলক অনাহার', তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ইয়েমেনের প্রাসঙ্গিকতা

মোটা দাগে 'জবরদস্তিমূলক অনাহার' বলতে মানবসৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষকেই বোঝানো হয়। এটি তিন ধরনের পরিস্থিতি আলাদাভাবে বা এই তিন ধরনের পরিস্থিতির সম্মিলিত উদ্ভবকে নির্দেশ করে। যেমন–জোর করে, শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে না খেয়ে থাকতে বাধ্য করা; অনাহার নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের অনুদান ও সাহায্য বন্ধ রাখা; এমনকি অনাহারী মানুষগুলোর অন্য কোথাও আশ্রয় নেয়ার পথটুকুও বন্ধ করে দেয়া। ইয়েমেনের নিরস্ত্র মানুষগুলোর ক্ষেত্রে এই তিন পরিস্থিতিই একসাথে আবির্ভূত হয়েছে।

জবরদস্তিমূলক এই অনাহারের শিকার কেবলই ইয়েমেনের ক্ষেত্রে ঘটছে, তা নয়। ইয়েমেন ছাড়াও অনেক দেশ অতীতে এ রকম ঘটনার শিকার হয়েছে। যেমন–১৯৪৩-৪৪ সালে অবিভক্ত বাংলা ব্রিটিশদের দ্বারা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়। প্রায় ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ব্রিটিশ বাংলায়।[৪] এর আগে ১৯৩২-৩৩ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আমলে ইউক্রেনে জোরপূর্বক অনাহার নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং এতে মৃত্যুর শিকার হয় ৬০ লাখ থেকে ৮০ লাখ মানুষ।[৫]

মধুশ্রী মুখার্জি তাঁর বই 'চার্চিল'স সিক্রেট ওয়ার'– এ ব্যাখ্যা করেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন চার্চিল কর্তৃক গৃহীত কিছু ভয়াবহ নীতি কীভাবে ভারতীয় উপনিবেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছে। তিনি তাঁর বইতে দেখিয়েছেন যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নির্দেশে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে প্রায় ৭০ হাজার টন চাল ব্রিটেনে রফতানি করা হয় ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসে।[৬] এ সময় ব্রিটিশ বাংলায় শস্য উৎপাদন মোটেই ভাল হয়নি এবং এতে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল।[৭] এটি করা হয়, যেন ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য যুদ্ধকালীন সময়ে শস্যের ভাল মজুদ থাকে। বারবার অনুনয় করা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বাংলায় কোন খাদ্য মজুদ বা বরাদ্দ দেয়া হয়নি এ সময়। আরও একটি ভয়ংকর নীতি প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তখন গ্রহণ করেছিলেন, যা 'ডিনায়েল পলিসি' নামে পরিচিত।[৮] এই নীতির আওতায় ব্রিটিশ বাংলার উপকূলে সব নৌচলাচল তখন বন্ধ করে দেয়া হয়। চার্চিলের আশঙ্কা ছিল, জাপানিরা নৌপথে আক্রমণ করতে পারে।[৯] তাদের ভয়ে শস্যাদিও ধ্বংস করা হয়েছিল।[১০] নৌচলাচল বন্ধ করার কারণে সব বাণিজ্য ও সাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে যায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য। অনেক মা-বাবা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় দুর্ভিক্ষের সময়; অনাহারে কেউ বা নিজেরাই হত্যা করে নিজেদের সন্তান।[১১] মধুশ্রী মুখার্জির মতে, এটি ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা ছিল।[১২]

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউক্রেনের ঘটনাটিকে কখনও 'হলোডমোর', 'টেরর-ফেমিন' অথবা দুর্ভিক্ষজনিত গণহত্যা নামে আখ্যায়িত করা হয়। যদিও ইতিহাসবিদদের এই অনাহারের কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবু এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ২০০৬ সালে ইউক্রেন এবং আরও ১৫টি দেশ ১৯৩২-৩৩ সালের এই জবরদস্তিমূলক অনাহারকে গণহত্যা হিসেবে শনাক্ত করেছে।[১৩] প্রাসঙ্গিকভাবে এও উল্লেখ্য যে কোন কোন ইতিহাসবিদ মনে করেন, তৎকালীন সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন ইউক্রেনের স্বাধীনতার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য বেশ কিছু নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'জবরদস্তিমূলক অনাহার'।

মাইকেল এলম্যান তাঁর দুটি প্রবন্ধে[১৪] দেখিয়েছেন কীভাবে স্ট্যালিন ১৯৩২-৩৩ সালে তাঁর বিরোধী-বিপ্লবীদের অনাহারের মাধ্যমে নিধনের চেষ্টা করেছিলেন। শোলোখভকে লেখা তাঁর চিঠিতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা।[১৫] মাইকেল এলম্যান মনে করেন, যুদ্ধের একটি সর্বজনীন কৌশল হল প্রতিপক্ষকে অনাহারের মাধ্যমে পরাভূত করা। যদিও ১৯৩১-৩২ সালে খরার কারণে ফসল উৎপাদন কম হয়েছিল, কিন্তু একই সাথে স্ট্যালিনের গৃহীত নীতিও দুর্ভিক্ষকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইউক্রেনে জবরদস্তি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পায়ন নীতি, খামার ও জমি রাষ্ট্রমালিকানাধীন করা এবং নতুন ধরনের শস্য উৎপাদন নিয়ে কৃষকদের বাধ্য করার কারণে তারা অসন্তুষ্ট ছিল। এ কারণে উৎপাদনও কমে গিয়েছিল। এ রকম অবস্থায় স্ট্যালিন ইউক্রেন থেকে ১৮ লাখ টন শস্য রফতানি করেন; দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগোষ্ঠীকে সে অঞ্চল থেকে অভিপ্রয়াণে বাধা দেন এবং বৈদেশিক সাহায্য-সহযোগিতার উদ্যোগও বন্ধ করেন।[১৬] এ সবই ইচ্ছাকৃত মনুষ্যসৃষ্ট জবরদস্তিমূলক অনাহারকেই নির্দেশ করে।

এই দীর্ঘ উদাহরণগুলো টেনে আনার কারণ হল দুর্ভিক্ষপীড়িত ইয়েমেনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বোঝা। ২০১১ সালের আরববসন্ত-পরবর্তী ইয়েমেনে গণতন্ত্র ফিরে আসেনি। ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন ৩২ বছরের স্বৈরশাসক আব্দুল্লাহ সালেহরই ভাইস প্রেসিডেন্ট মনসুর হাদি। এরপর ২০১৫ সালে শিয়া হুথি সম্প্রদায় কর্তৃক রাজধানী সানা দখল এবং হাদিকে ক্ষমতাচ্যুত করার মধ্য দিয়ে গৃহযুদ্ধের শুরু। হাদি সরকারকে পুনর্বহালের জন্য সৌদি আরবের নেতৃত্বে তখন গঠিত হয় কোয়ালিশন ফোর্স। আর শুরু হয় বিমান

হামলা 'অপারেশন ডিসাইসিভ স্টর্ম'। ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৯ সাল পর্যন্ত সৌদি নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী ইয়েমেনে ১৯ হাজার বার বিমান আক্রমণ চালায়।[১৭] দুই-তৃতীয়াংশ আক্রমণই হয়েছে বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর। আর বাকি আঘাতগুলো সম্পর্কে যৌথ বাহিনী নিশ্চিতভাবে জানে না কোথায় হয়েছে। এতে ৬০ হাজার ব্যক্তি নিহত হয়েছে।[১৮] বিভিন্ন খবরে প্রকাশিত হয়, সৌদি বাহিনী বিমান আক্রমণের ক্ষেত্রে ইয়েমেনের সাধারণ মানুষকে টার্গেট করেছে। কখনও তাদের ঘরবাড়ি, কখনও স্কুল, কখনও হাট-বাজার, মসজিদ অথবা গাড়িগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে বোমার আঘাতে। কখনও বা মানুষকে হতাহত করেছে বিয়েবাড়ি, শেষকৃত্য অথবা কোন সামাজিক সম্মেলনের কেন্দ্রে বোমা আক্রমণ করে। রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর, তেল ও গ্যাসক্ষেত্রগুলো, পানি ও বিদ্যুৎকেন্দ্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বন্দর–কোন কিছুই রেহাই পায়নি এই বিমান হামলা থেকে।[১৯] ন্যাশনাল হেরিটেজগুলোকেও টার্গেট করা হয়েছিল এই বিমান হামলায়।[২০]

সবচেয়ে মর্মান্তিক হলো, সৌদি সরকার কর্তৃক মার্চ ২০১৫ থেকে ইয়েমেনের সব সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া এবং বিমান ও নৌ চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা।[২১] সৌদি আরব যুক্তি দেয় যে, হুথি বিদ্রোহীদের কাছে ইরানের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করাই ছিল এই জল-স্থল-আকাশ অবরোধের উদ্দেশ্য। তাছাড়া তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হাদি সরকারকে পুনর্বহালও করতে চায়। তখন থেকে সব খাদ্য, চিকিৎসা ও মানবিক সাহায্যও বন্ধ হয়ে যায়। অনাহারের শিকার ইয়েমেনি জনগোষ্ঠীর আলোচনা তো আগেই হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০১৮ নাগাদ ১১ লাখের ওপর ইয়েমেনি কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল। এতে ২ হাজার ৩৮৫ জনের মৃত্যু ঘটে এ সময়।[২২] দুর্ভাগ্যবশত পুরো বিশ্ব সৌদি আরবের এ রকম ঘৃণ্য অন্যায়ের ব্যাপারে নীরব ছিল।

অন্যদিকে নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়, সৌদি আরবে অবস্থানরত হাদি সরকার ২০১৬ সালে ইয়েমেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি সানা থেকে এডেনে স্থানান্তর করে। এই স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটির কার্যক্রম সৌদি আরব নিয়ে নেয়। প্রথমেই ব্যাংকটি ৬০ হাজার কোটি (৬০০ বিলিয়ন) রিয়াল প্রিন্ট করে, যার ফলে ইয়েমেনে ভয়ংকর মুদ্রাস্ফীতি তৈরি হয়। বেশির ভাগ ইয়েমেনি তখন কপর্দকহীন হয়ে পড়ে।[২৩] তারপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি হুথি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে কর্মরত বেসামরিক আমলাদের বেতন বন্ধ করে দেয়। শতকরা ৮০ ভাগ আমলা বা সরকারি চাকরিজীবীরা হুথি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে কর্মরত থাকার কারণে তারা আর কোন বেতন পায়নি।[২৪]

ইয়েমেনে কেন এই দুর্ভিক্ষ বা জবরদস্তিমূলক অনাহার

ইয়েমেনের দুর্ভিক্ষ বা জবরদস্তিমূলক অনাহারের কারণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিশ্লেষকদের একটা বড় প্রবণতা হল শুধুমাত্র সেই দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতাকে দৃশ্যমান করা। এর ফলে এড়িয়ে যাওয়া হয় বিদেশি পরাশক্তিগুলোর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে ইয়েমেনে তাদের নিরন্তর কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রয়াসকে। কেউ কেউ এটাকে 'শিয়া-সুন্নি' সমস্যা হিসেবেও দেখতে চায়। তবে এটাও ঠিক যে, দীর্ঘ সময় ধরে স্বৈরশাসন ব্যবস্থা, দুর্নীতি এবং জাতিগত অন্তর্দ্বন্দ্ব এমন একটি দুর্বল রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে, যা বিদেশি পরাশক্তিগুলোর জন্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাই ইয়েমেনে জবরদস্তিমূলক অনাহারের কারণগুলোকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করে লেখাটির এই অংশে আমরা তুলে ধরব কীভাবে বিদেশি পরাশক্তি, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরবের সম্প্রসারণ ও কর্তৃত্ববাদী নীতি ইয়েমেনে একটি ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছে। প্রথম ভাগে ইয়েমেনের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিশেষণের মধ্য দিয়ে আলোকপাত করা হবে তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা ও সংকটের প্রকৃতির ওপর এবং দ্বিতীয় ভাগে বিদেশি পরাশক্তিদের ইয়েমেনে হস্তক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই কারণগুলো এখানে পাঠকের সুবিধার্থে আলাদাভাবে উপস্থাপিত হলেও এগুলো ইয়েমেনের রাজনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় যুগপৎ, আলাদাভাবে আবির্ভূত হয়নি।

১. ইতিহাসের আলোকে ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সংকটের প্রকৃতি

ষোড়শ ও ঊনবিংশ শতকে উত্তর ইয়েমেন অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন এবং জাইদি শিয়া ইমাম দ্বারা শাসিত ছিল।[২৫] ১৯১৮ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর জাইদি ইমাম ইয়াহিয়া সরাসরি শাসনভার নিয়েছিলেন উত্তর ইয়েমেনের।[২৬] ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে চাপা অসন্তোষ শুরু হয়।[২৭] এই চাপা অসন্তোষ সংকটে পরিণত হয়, যার চরম প্রকাশ ঘটে ১৯৪৮ সালে ইমাম ইয়াহিয়ার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে; যদিও তাঁর পরিবার নিপীড়নের ওপর ভর করে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শাসনক্ষমতা দখল করে রাখতে পেরেছিল। সেই বছর সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছিল ইমাম আহমেদের ছেলে ইমাম বদরকে হটিয়ে।[২৮] আর মূলত তখন থেকেই শুরু হয় ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধের সময় সৌদি আরব ও জর্দান সমর্থন দেয় রাজবাহিনীকে আর মিসর সমর্থন দিয়েছিল নতুন গঠিত রিপাবলিক ও তার সেনাবাহিনীকে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে মিসরীয়রা তাদের বাহিনী সরিয়ে নেয় এবং ছয় বছরের গৃহযুদ্ধ শেষে ইয়েমেনের সেনাবাহিনী জয়ী হয়।[২৯] ১৯৭০ সালে সৌদি আরব নতুন গঠিত ইয়েমেন আরব রিপাবলিককে স্বীকৃতি দেয়।[৩০]

অন্যদিকে দক্ষিণ ইয়েমেন ১৮৩৯ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের অধীন ছিল।[৩১] পরবর্তীকালে এডেনকে মূল উপনিবেশ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে এডেনের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলকে ব্রিটেনের সংরক্ষিত রাজ্যের স্বীকৃতি (Protectorate States) দেয়া হয়। ১৯৬৫ সাল নাগাদ ব্রিটেনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চল ফেডারেশন অব সাউথ অ্যারাবিয়া নাম ধারণ করে। তবে ১৯৬৭ সালে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট নামের সমাজতান্ত্রিক দল মিসরের রাষ্ট্রপতি গামাল আবদেল নাসেরের সহযোগিতায় ব্রিটিশদের হটাতে সক্ষম হয়। তারা ক্ষমতায় এসে ফেডারেশন অব সাউথ অ্যারাবিয়া নাম পালটে পিপলস রিপাবলিক অব ইয়েমেন রাখে।[৩২] ১৯৭০ সালে নাম পরিবর্তন করে আবির্ভূত হয় পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ইয়েমেন।[৩৩]

এরপর ১৯৭২ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।[৩৪] এই যুদ্ধে সৌদি আরব উত্তর ইয়েমেনকে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন দক্ষিণ ইয়েমেনকে অস্ত্র সরবরাহ করে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে একটি যৌথ সরকার গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।[৩৫] তারা দেশ দুটিকে একীভূতকরণ চুক্তিতেও সম্মত হয় এবং একটি অবিচ্ছিন্ন সংসদ ও সংবিধানের অঙ্গীকার করে।

উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন একত্রীকরণের পর ১৯৯৩ সালে তাদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তর ইয়েমেনের দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসক আলী আব্দুল্লাহ সালেহ নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে উত্তর ইয়েমেন শাসন করছিলেন।[৩৬] দীর্ঘদিনের যুদ্ধ ইয়েমেনে সমস্যা ও সংকটকে ভয়াবহ রূপ দিতে শুরু করে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে সালেহর শাসনামলে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজধানী সানার বাইরে কোথাও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। সুবিধাজনক পদে নিজেদের

লোককে নিয়োগ দেয়া এবং পৃষ্ঠপোষকতামূলক নীতির ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকে সালেহ সরকার। একই সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব উসকে দিয়ে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা চালান প্রেসিডেন্ট সালেহ। এর ফলে একটি ভঙ্গুর, বিভাজিত, ক্ষয়িষ্ণু ও জনবিমুখ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এতে বিভিন্ন উগ্রবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। যেমন–দক্ষিণ ইয়েমেনে আল-কায়েদা ফর অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা এবং আনসার-আল-শরিয়া ঘাঁটি তৈরি করে ফেলে। আর উত্তরে শিয়া হুথি আন্দোলন শুরু হয় জাইদি বংশধরদের নেতৃত্বে। ২০০৪ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে মোট ছয়টি বিদ্রোহ ঘটে সালেহ সরকারের পতনের দাবিতে।[৩৭]

ইয়েমেনে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর হস্তক্ষেপের একটি ভাল সুযোগ বা ক্ষেত্র আসলে তৈরি হয় ইয়েমেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে। তীব্র ক্ষোভের মুখে সালেহ সরকারের পতন হয় ২০১১ সালে–তিউনিসিয়া আর মিসরে আবির্ভূত আরব বসন্তের ধারাবাহিকতায়। সেই সাথে তৈরি হয় গৃহযুদ্ধের প্রারম্ভিক ক্ষেত্র, যা বিদেশি শক্তিগুলোকে প্ররোচিত করে হস্তক্ষেপে। বছরটা শুরু হয় সাংবাদিক নির্যাতন ও প্রচারমাধ্যমের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। ওই বছরের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট আব্দুলাহ সালেহ সংবিধান পরিবর্তন করতে উদ্যত হয়েছিলেন, যাতে ২০১৩ সালের নির্বাচনে তিনি আবার দাঁড়াতে পারেন।[৩৮] এই প্রচেষ্টাটি নিয়ে ইয়েমেনে প্রচণ্ড সমালোচনার ঝড় তৈরি হয়। ধারণা করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট সালেহর ছেলে আহমেদ শাসনভার বুঝে নিতে না পারবে, ততক্ষণ সালেহ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকবেন। এর প্রতিবাদে সে সময় প্রায় ২০ হাজার লোক রাজধানী সানার রাস্তায় অবস্থান নেয়।[৩৪] প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে ইয়েমেনের অন্যান্য শহরেও–আল-হুদাইদা, তাইজ, এডেন, আল-ঘাইদা, আল-জাবিদ, জিঞ্জিবার ইত্যাদি।[৩৮]

কিন্তু ১৮ মার্চ ২০১১-তে সালেহর বাহিনীর তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হয় 'ফ্রাইডে অব ডিগনিটি' হত্যাযজ্ঞ।[৩৬] এতে ৪৫ জনের মৃত্যু হয় এবং আহত হন প্রায় ২০০।[৩৯] সাদা পোশাকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী নিরস্ত্র মানুষকে আক্রমণ ও হত্যা করে।[৪০] আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কেবল দর্শক হয়ে তা প্রত্যক্ষ করে। এই ঘটনাটির প্রতিবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে ইয়েমেনব্যাপী। প্রেসিডেন্ট সালেহর দলে দেখা দেয় ভাঙন। আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতে গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) হস্তক্ষেপ করে। চাপ প্রয়োগ করে প্রেসিডেন্ট সালেহকে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার জন্য। জিসিসির উদ্যোগে ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুরাব্বু মনসুর হাদির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।[৪১] ২০১২ সালে নির্বাচনেও জয়ী হন মনসুর হাদি।[৪২] কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার দুই বছরের মাথায় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক খাতে গৃহীত সব পদক্ষেপের জন্য অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে ইয়েমেনে।

প্রথমেই নিরাপত্তা খাতে পরিবর্তন আনতে চান প্রেসিডেন্ট হাদি। সালেহ সমর্থক ও তাঁর আস্থাভাজন আত্মীয়দের প্রথমেই সরানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি।[৪৩] উচ্চপদস্থ ও মধ্যম সারির অফিসারদের স্থলাভিষিক্ত করতে না পেরে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়।[৪৪] ২০১২ সালের মে মাস নাগাদ হত্যা করা হয় শতাধিক অফিসারকে।[৪৫] সালেহর বিশ্বস্ত অনেককে পাঠিয়ে দেয়া হয় বিদেশে।

দ্বিতীয়ত, ইয়েমেনকে প্রদেশভিত্তিক ছয়টি যুক্তাঞ্চলে (Federal Regions) বিভক্ত করার রূপরেখা নিয়ে মতদ্বৈত দেখা দেয়। ছয়টি প্রদেশ নিয়ে ভাগ করার প্রস্তাব আসে হাদি সরকারের কাছ থেকে। এতে ক্ষুব্ধ হয় শিয়া হুথিরা। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ইয়েমেনকে ধনী ও দরিদ্র–এ দুই ভাগে বিভাজিত করা হচ্ছে বলে তারা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে।[৪৬] এ রকম আঞ্চলিক বিভাজনের ফলে লোহিত সাগরে গমন ও তেল-গ্যাসের মত প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করে হুথিরা।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রচেষ্টা আসে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তারই অংশ হিসেবে বিদেশি শক্তি, বিশেষত সৌদি আরব ও কাতারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয় সব রাষ্ট্রীয় সম্পদ। এতে কেউই আর হাদি সরকারের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি।[৪৭] শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পানি ও বিদ্যুৎ সেবা, বেকারত্ব–কোন ক্ষেত্রেই হাদি সরকার সফল হতে পারেনি। উল্টো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শে ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দেয়।[৪৮]

এ রকম পরিস্থিতিতে, ২০১৫ সাল নাগাদ এসে ইয়েমেনের রাজনৈতিক সংকটকে ঘিরে মোটা দাগে দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর অঞ্চলভেদে আধিপত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে হুথি বিপবী, যারা উত্তর ইয়েমেনের পাহাড়ি অঞ্চলের শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে সৌদি আরব ও পাশ্চাত্য সমর্থিত হাদি সরকার।

হুথি বিপ্লবীরা সালেহ সমর্থকদের সাথে এসময় জোট গঠন করে বছরের শুরুতেই রাজধানী সানা দখল করে। হুথিরা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫-তে একটি সাংবিধানিক বিপ্লবী পর্ষদ (Constitutional Revolutionary Committee) ঘোষণা করে, যা দুই বছর মেয়াদের জন্য শাসনকাজ পরিচালনা করবে।[৪৯] অন্যদিকে প্রথমে গৃহবন্দি থাকার পর ২১ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট হাদি সৌদি আরবে পালিয়ে যান এবং পদত্যাগ প্রত্যাহার করে শাসনক্ষমতা পুনর্বহাল করার দাবি জানান।[৫০] ইয়েমেনের দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সুযোগে জিসিসির মাধ্যমে সৌদি আরব ইয়েমেনে আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যায়। সেজন্য একটি যৌথ বাহিনী (Coalition Force) গঠন করে ২০১৫ সালে। এতে বাহরাইন, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার যোগ দেয়। এতে সমর্থন দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিসর, জর্দান, মরক্কো, সুদানসহ অনেক দেশ।

তবে কৌতূহল উদ্দীপক ব্যাপার হল, ইয়েমেন আয়তনে ছোট একটি দেশ এবং তেলসম্পদে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য তেলসমৃদ্ধ দেশের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। জিডিপির দিক থেকেও ইয়েমেনের অবস্থান বিশ্ব তালিকায় ১১৩ নম্বরে।[৫১] বেকারত্বও ভয়াবহ, প্রায় ৬০ শতাংশ।[৫২] উপার্জনশীল জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশই কৃষিকাজে জড়িত থাকলেও জিডিপির মাত্র ১৩ শতাংশ আসে কৃষি থেকে (২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী)।[৫৩] কেননা বেশির ভাগ ইয়েমেনি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রায় ৯০ শতাংশ 'খাত'/'কাত' নামে একটি নেশাজাত পাতা সেবন করে[৫৪] এবং বিগত বছরগুলোতে শুধু খাত/কাতই উৎপাদন করছিল। তাই খাদ্যশস্যের জন্য দেশটি সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভর। সৌদি নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী অবরোধ দেয়ার কারণে আল-হুদাইদা ও সালিফ বন্দর দিয়ে খাদ্য জোগানের যে ৮০-৯০ শতাংশ আমদানি হত তা বন্ধ হয়ে যায়।[৫৫] এতে খাদ্যের তীব্র সংকটের সাথে সাথে দামও হয় আকাশচুম্বী। ইয়েমেনের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী ও কর্মকর্তারা বেতন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় গৃহযুদ্ধের কারণে।[৫৬]

পানির অপ্রতুলতাও ইয়েমেনের আরেকটি বড় দুর্বলতা। পানির তীব্র সংকট থাকা সত্ত্বেও ইয়েমেনিরা সানা অববাহিকা (Basin) থেকে প্রাপ্ত ৪০ শতাংশ পানিই ব্যবহার করত 'খাত'/'কাত' উৎপাদনে।[৫৭] অথচ ইয়েমেনে খাওয়ার পানির তীব্র অভাব রয়েছে। তাদের ভূগর্ভস্থ পানিরও তীব্র সংকট রয়েছে। সানায় ভূগর্ভস্থ পানি ১৯৭০ সালে ছিল ৩০ মিটার নিচে, আর এখন ১২০০ মিটার নিচেও পানি পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। একজন ইয়েমেনি গড়ে বছরে মাত্র ১৪০ কিউবিক মিটার পানি পায় ব্যবহারের জন্য। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে পায় ১০০০ কিউবিক মিটার। কলেরা দেখা দেয়ার পর সংকট উত্তরণের জন্য তাই তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি দেশটি।[৫৮]

এসব নেতিবাচক সূচকের পরও প্রশ্ন আসে–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান ইয়েমেনের ব্যাপারে আগ্রহী কেন এবং কেনই বা তারা ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে।

২. বিদেশি শক্তির ইয়েমেনে হস্তক্ষেপ

বিদেশি শক্তিগুলোর ইয়েমেন নিয়ে অতি আগ্রহের কারণ হিসেবে ইয়েমেনের ভৌগোলিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য সবচাইতে বেশি আলোচিত হয়। লোহিত সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে ইয়েমেন এমনভাবে অবস্থান করছে যে, বিশ্ব তেল রফতানিকারকরা একে 'গোবাল চোকপয়েন্ট' বলে আখ্যায়িত করে।[৫৯] লোহিত সাগরের এই অংশটিকে বলা হয় বাব-আল-মান্দাব অথবা 'গেট অব টিয়ারস'।[৬০] বাব-আল-মান্দাব লোহিত সাগরকে আরব সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। এর এক পাশে ইয়েমেন, অন্য পাশে জিবুতি। এটি আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মাঝে অবস্থিত এবং ভূমধ্য সাগর ও ভারত মহাসাগরের যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রণালি। বাব-আল-মান্দাব দিয়েই পারস্য উপসাগরের (পার্সিয়ান গালফ) সব পণ্যসামগ্রী বহন করা হয় সুয়েজ খালের দিকে। শুধুমাত্র ২০১৩ সালের এক হিসাব অনুযায়ী, বাব-আল-মান্দাব দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৩৮ লক্ষ টন খনিজ তেল এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও এশিয়ায় রফতানি হয়।[৬১] ফলে ইয়েমেনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারার মানে হল এই পুরো প্রণালিটির ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়া, যা সৌদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইরানকে কৌশলগত দিক থেকে অনেক ক্ষমতাধর বা শক্তিশালী করে তুলবে। তাই ইয়েমেনকে একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন রাখাই বিশ্বশক্তিগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ইয়েমেনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সফল হলে সেদেশের সব সম্পদের ওপর, ব্যবসার ওপর, অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের ওপর, সম্ভাব্য তেল ও গ্যাসের মজুদের ওপর, কৃষি ও মৎস্যসম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করা সম্ভব। এই সুযোগগুলো বিশেষভাবে সৌদি আরবকে একটি আঞ্চলিক পরাশক্তিতে পরিণত হতে সাহায্য করবে।

ইয়েমেন যুদ্ধের কারণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিষয়টি উপেক্ষা করতে দেখা যায় গতানুগতিক প্রচারমাধ্যমগুলোতে। ইয়েমেনে ইরানের প্রভাব দমনে সৌদি আরব ও তার জোট সামরিক অভিযানের ভূমিকাকেই শুধু সামনে আনা হয়। এই যুক্তিটিকে পুরোপুরি অমূলক বলা যায় না। কেননা শিয়া-সুন্নি বিভেদকে কেন্দ্র করে ইরানের সাথে সৌদি আরবের দ্বন্দ্ব কয়েক যুগ ধরে বিরাজমান। ইতিহাসের একটি বড় অংশ জুড়ে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোতে সুন্নিরাই সংখ্যালঘু হয়েও শাসন করেছে। ইরাকের সাদ্দাম সরকার, বাহরাইনে সৌদি সমর্থিত খলিফা এবং ইরানের পাহলভিরা এ রকম শাসনের উদাহরণ। আর সংখ্যালঘু সুন্নি শাসকরা ক্ষমতায় টিকে থাকে অনেকাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায়। যেমন–সৌদি আরবের সুন্নি শাসকদের সাথে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে সহজ শর্তে ও কম দামে তেলের চাহিদা নিশ্চিত করার কৌশল বহু বছর ধরে বলবৎ রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিনিময়ে সৌদি শাসকরা পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সহযোগিতা। মধ্যপ্রাচ্যে সুন্নি নেতৃত্বে পরিবর্তন প্রথম আসে ইরানে শিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ইরাকে মার্কিন অধিগ্রহণের সময় কুর্দি-শিয়া নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসে।

তাই বেশির ভাগ প্রচারমাধ্যম ও পণ্ডিতগণ বলছেন, সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট ইয়েমেনে শিয়া নেতৃত্বকে ঠেকানোর জন্যই মূলত সেখানে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।[৬২] শিয়া সরকার স্বভাবতই ইরানের সাথে ঘনিষ্ঠ হবে এবং ইরান ইতোমধ্যেই হুথি বিদ্রোহীদের নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তাই যে কোন মূল্যে মনসুর হাদি সরকারকে পুনর্বহাল করাই সৌদি জোটের লক্ষ্য। কিন্তু এই বয়ানটি সৌদি জোটের ইয়েমেন নীতি ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা সাদ্দাম সরকারের পতনের পর মার্কিনরা শিয়া কুর্দিদের ক্ষমতায় বসিয়েছে, এতে যে ইরানের কৌশলগত সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে, সেটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে সৌদি আরবও কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। তাই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণগুলো এক্ষেত্রে অনেক বেশি জোরালো।

এটা অজানা নয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি মূলত জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেন্দ্রিক। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনওই সরাসরি তেলখনিগুলো দখল করার চেষ্টা করেনি অথবা কোন রাষ্ট্রকে অধিগ্রহণ নীতি গ্রহণ করেনি। তার বদলে তৈরি করেছে এমন একটি ক্ষমতাবলয়, যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের শাসকগোষ্ঠী নির্বিঘ্নে সব সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তেল অথবা জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে। তাই এসব শাসকগোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখতে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা সহযোগিতা প্রদান করে এসেছে বহু বছর ধরে, যতই তারা তাদের বৈষম্যমূলক, কখনও বা নির্মম নির্যাতনকারী জনসমর্থনহীন অপরাজনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালী হয়ে উঠুক না কেন। বরং এই ধরনের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, অপরাজনৈতিক অবকাঠামো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে অত্যন্ত সহায়ক।

উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল মধ্যপ্রাচ্যকে সামরিকীকরণে উৎসাহিত করা। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ অস্ত্র মধ্যপ্রাচ্যের তেল-স্বৈরাচারদের কাছে বিক্রি করে। আর তৈরি করে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী স্বৈরাচারী ব্যবস্থা। এই শাসকরা নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধেই এই অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতি হল ওই অঞ্চলে এমন একটি অস্থিতিশীল ক্ষমতা-ভারসাম্য তৈরি করা, যাতে একই সাথে নিজেদের জন্য সহজে তেল আমদানি ও মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র রফতানি নিশ্চিত করা যায়।

সৌদি আরবের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব অনেকাংশে এই উদ্দেশ্যগুলোকেই নির্দেশ করে। ইয়েমেন গৃহযুদ্ধে সৌদি আরবের সাথে যে মার্কিন জোট তা ওপরে আলোচিত তিনটি উদ্দেশ্যের বাইরে কিছু নয়। শুধুমাত্র ২০১৭ সালেই মার্কিনরা ৭০০ কোটি (৭ বিলিয়ন) ডলার সমমূল্যের 'প্রেসিশন গাইডেড মিউনিশন্স' সৌদি আরবের কাছে বিক্রি করেছে।[৬৩] আকাশপথে এফ-১৫ যুদ্ধবিমান সৌদি ঘাঁটি থেকে উড্ডয়ন করা থেকে শুরু করে ইয়েমেনে বোমা নিক্ষেপ করা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া মার্কিন সেনাদের তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। যুদ্ধবিমান মেরামত, টার্গেট ঠিক করা অথবা পাইলট ট্রেনিং–সবকিছুই মার্কিন সেনাদের কল্যাণে পাচ্ছে সৌদি আরব। প্রায় ১০০ মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা কোয়ালিশন বাহিনীতে উপদেষ্টার কাজ করছে।[৬৪] শুধু তা-ই নয়, যুক্তরাষ্ট্র ১২৯ কোটি (১.২৯ বিলিয়ন) ডলারের ক্লাস্টার বোমা, ১১৫ কোটি (১.১৫ বিলিয়ন) ডলারের ট্যাংক এবং ৫০ কোটি (অর্ধ বিলিয়ন) ডলারের গোলাবারুদ বিক্রি করেছে সৌদি আরবের কাছে।[৬৫] ওবামা আমলে ১০১৫ কোটি (১১৫ বিলিয়ন) ডলারের অস্ত্র চুক্তিও করে দেশটি।[৬৬]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্য থেকে ২০ হাজার ২৭৩ কোটি (২.২৭৩ ট্রিলিয়ন) ডলার সমমূল্যের তেল আমদানি করে, যা তার মোট জিডিপির [১,৬৭২ কোটি (১৬.৭২ বিলিয়ন) ডলার] ১৩.৬ শতাংশ।[৬৭] একই বছর তারা অপরিশোধিত তেল আমদানি করে ১৮৬ বিলিয়ন ডলারের।[৬৮] অন্যদিকে ২০১৩-১৭ সালের মধ্যে সৌদি আরবের কাছে মার্কিনরা অস্ত্র বিক্রি করে ৯০০ কোটি (৯ বিলিয়ন) ডলারের।[৬৯] সৌদি রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা এবং তার সকল নিরাপত্তা

নিশ্চিত করার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র পায় সহজ শর্তে তেল আমদানি চুক্তি। একইভাবে যুক্তরাজ্য সৌদি আরবের কাছে ২০১৫-১৬ সালে অস্ত্র বিক্রি করে ১০৬ কোটি (১.৬ বিলিয়ন) ডলারের।[৭০] আর ইয়েমেনকে সাহায্য দেয় মাত্র ১৩ কোটি (১৩০ মিলিয়ন) ডলারের।[৭১] এই সূচকগুলোই নির্দেশ করে কেন সৌদি রাজতন্ত্র মার্কিনদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ। আর কেনই বা মধ্যপ্রাচ্যে ইয়েমেনের মত একটি দরিদ্র দেশেও সৌদি আরবের মাধ্যমে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

সৌদি আরবের সাথে ইয়েমেনের সীমারেখা ১,৪৫৮ কিলোমিটার। ইয়েমেনে সৌদি রাজতন্ত্র-বান্ধব সরকার তাই অতীব প্রয়োজনীয় তার জন্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৪ সালে আইএমএফের শর্তাবলি পূরণের লক্ষ্যে মনসুর হাদির সরকার ইয়েমেনের সকল রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেসরকারীকরণের জন্য বিক্রি করলে সৌদি আরব আর কাতার ইয়েমেনের সম্পদগুলো কিনে নেয়। তাই ইয়েমেনে হাদি সরকার সৌদিদের জন্য সবচাইতে বিশ্বস্ত। আর তাদের ক্ষমতায় ফের বসানোর জন্যই এই জবরদস্তিমূলক অনাহার।

এখানে লক্ষণীয় হলো, সৌদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত–কেউই ইয়েমেন সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান প্রণয়নে আগ্রহী নয়। উত্তর আর দক্ষিণ ইয়েমেন যেন একত্রিতভাবে থাকতে পারে সেই চেষ্টাও তাদের ভেতর দেখা যাচ্ছে না। বরং ইয়েমেনের সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করাই তাদের মূল লক্ষ্য। তাদের দৃষ্টিতে, হাদি সরকারই ইয়েমেনের একমাত্র বৈধ সরকার।

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই যে ইয়েমেনের ওপর জবরদস্তিমূলক অনাহারের নীতি অবলম্বনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের যৌথ বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও। সংযুক্ত আরব আমিরাত ইয়েমেনের দক্ষিণ অংশে স্থায়ী কর্তৃত্বের লক্ষ্যে বাব-আল-মান্দাব প্রণালিতে অবস্থিত পারস্য দ্বীপে (পার্সিয়ান আইল্যান্ড) বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করে।[৬৮] বিশালাকার নৌঘাঁটিও নির্মাণ করে ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, বারবারা, আসাব ও বসসোতে।[৬৯] এই ঘাঁটিগুলোকে সেনা প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সামরিক আর বেসামরিক অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্যও সংযুক্ত আরব আমিরাত বিনিয়োগ করেছে সোকত্রাতে।[৭০]

এছাড়াও ইয়েমেনের ইসলাহ নামের মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শে বিশ্বাসী দলটিকে সৌদি আরব সমর্থন দেয় আর সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থন দেয় স্থানীয় সালাফিদের, যারা ইসলাহদের চেয়েও উগ্রপন্থী এবং আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত বলে ধারণা করা হয়।[৭১] সংযুক্ত আরব আমিরাত মুসলিম ব্রাদারহুডকে একেবারেই সমর্থন করে না। অন্যদিকে ইরান সমর্থন দেয় শিয়া হুথি সম্প্রদায়কে, সৌদি আরব যাদের চরম বিরোধী।[৭২] আবার সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরানের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে আগ্রহী।

এসব স্বার্থদ্বন্দ্বগুলো ইয়েমেন যুদ্ধকে আরও প্রলম্বিত ও জটিল করে তুলেছে। এখানে কোন গঠনমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করার প্রয়াস নেই কারও। নেই কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোন নীতি। কেবলমাত্র সৌদি আরব ও পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট একটি দুর্নীতিগ্রস্ত পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় পুনঃস্থাপন করাই লক্ষ্য।

উপসংহার

ইয়েমেনের দুর্ভিক্ষকে শুধু গৃহযুদ্ধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা শিয়া-সুন্নি বিভাজনের রাজনীতি দিয়ে বোঝাই যথেষ্ট নয়। এই জবরদস্তির অনাহার সৌদি আরব, তার মিত্র আর পরাশক্তির, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত মধ্যপ্রাচ্য নীতির ফলাফল। এই সমস্যাটি বোঝার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপট বিশেষণ জরুরি। এই লেখাটিও সেভাবেই ব্যাখ্যা করেছে ইয়েমেনে জবরদস্তির অনাহারকে। ব্যাখ্যাটির মধ্য দিয়ে একটা চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইয়েমেন মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোর মত ওরকম সম্পদশালী না হলেও একদিকে মূলত তার ভৌগোলিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য, একব্যক্তিকেন্দ্রিক দুর্বল রাষ্ট্রকাঠামো, অন্যদিকে রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সৌদি শাসকদের আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা বিদেশি পরাশক্তিগুলোর নিজস্ব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থে নিরন্তর কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ ও তা অর্জনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ইয়েমেন হয়ে উঠেছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক সীমাহীন দুঃখগাঁথা। আর তাদের জন্য এই দুঃখগাথার অন্যতম প্রকাশ হল জবরদস্তির অনাহার, যার অতীত সাক্ষী সাবেক সোভিয়েত ইউক্রেন অথবা ব্রিটিশ ভারত।

সায়মা আহমেদ : সহকারি অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : saima.ahmed.ir@gmail.com
মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : tanzim04@gmail.com

তথ্যপঞ্জি

১। Palko Karasy (2018), '85,000 Children in Yemen May Have Died of Starvation', The New York, 21 November, available at https://www.nytimes.com/2018/11/21/world/middleeast/yemen-famine-children.html

২। প্রাগুক্ত

৩। প্রাগুক্ত

৪। Soutik Biswas (2018), 'How Churchill 'starved' India', BBC, 28 October, available at http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/soutikbiswas/2010/10/how_churchill_starved_india.html

৫। See https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-famine -of- 1932-33

৬। Modhusree Mukerjee (2010), *Churchill's Secret War : The British Empire and Ravaging of India during World War II,* New York : Basic Books

৭। প্রাগুক্ত

৮। প্রাগুক্ত

৯। প্রাগুক্ত

১০। প্রাগুক্ত

১১। প্রাগুক্ত

১২। প্রাগুক্ত

১৩। https://web.archive.org/web/20151231045936/http://www.holodomoreducation.org/news.php/news/4.

১৪। Michael Ellman (2005), 'The Role of Leadership Perceptions and of Intent in the Soviet Famine of 1931-1934', Europe-Asia Studies, vol. 57, no. 6, September, pp. 823-841; and Michael Ellman (2007), 'Stalin and the Soviet Famine of 1932-33 Revisited', *Europe-Asia Studies,* vol. 59, no. 4, June, pp. 663-693

১৫। Michael Ellman (2005), 'The Role of Leadership Perceptions and of Intent in the Soviet Famine of 1931-1934', *Europe-Asia Studies,* Vol. 57, No. 6, September 2005, p. 824

১৬। Michael Ellman (2007), 'Stalin and the Soviet Famine of 1932-33 Revisited', *Europe-Asia Studies,* vol. 59, no. 4, June, p. 684

১৭। 'Death from Above: Every Saudi Air Raid on Yemen', *Aljazeera,* available at

https://interactive.aljazeera.com/aje/2018/Saudi-Arabia-air-raids-on-Yemen/index.html.

১৮ । প্রাগুক্ত

১৯ । See https://theconversation.com/us-complicity-in-the-saudi-led-genocide-in-yemen-spans-obama-trump-administrations-106896

২০ । Iona Craig (2015), 'The Agony of Saada: US and Saudi Bombs Target Yemen's Ancient Heritage', *The Intercept,* 16 November, available at https://theintercept.com/2015/11/16/u-s-and-saudi-bombs-target-yemens-ancient-heritage/

২১ । Lori Plotkin Boghardt and Michael Knights (2016), 'Border Fight Could Shift Saudi Arabia's Yemen War Calculus', The Washington Institute Policy Analysis, available at ttps://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/border-fight-could-shift-saudi-arabias-yemen- war-calculus

২২ । Anton Camachi et. al. (2018), 'Cholera Epidemic in Yemen, 2016-18: An Analysis of Surveillance Data', *The Lancet Global Health,* vol. 6, no. 6, pp. e680-e690, available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5952990/

২৩ । Declan Walsh and Tyler Hicks (2018), 'The Tragedy of Saudi Arabia's War', The New York Times, 26 October, available at https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/26/world/middleeast/saudi-arabia-war-yemen.html

২৪ । প্রাগুক্ত

২৫ । 'Country Profile: Yemen', A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress, under an Interagency Agreement with the Department of Defense, 2006

২৬ । প্রাগুক্ত

২৭ । প্রাগুক্ত

২৮ । প্রাগুক্ত

২৯ । প্রাগুক্ত

৩০ । 'South Yemen History', available at https://www.globalsecurity.org/military/world/yemen/yemen-south.html

৩১ । প্রাগুক্ত

৩২ । প্রাগুক্ত

৩৩ । 'Country Profile : Yemen', A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress, under an Interagency Agreement with the Department of Defense, 2006

৩৪ । প্রাগুক্ত

৩৫ । প্রাগুক্ত

৩৬ । প্রাগুক্ত

৩৭ । Helen Lackner (2017), '*Yemen in Crisis : Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State,* London: Saqi Books

৩৮ । প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

৩৯ । প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

৪০ । প্রাগুক্ত

৪১ । 'GCC Supports Hadi as Yemen's Legitimate President', 26 February 2015, available at https://www.middleeastmonitor.com/20150226-gcc-supports-hadi-as-yemens-legitimate-president/

৪২ । 'New Yemen President Abdarbbuh Mansour Hadi Takes Oath', 25 February 2012, available at https://www.bbc.com/news/world-middle-east-17163321

৪৩ । Helen Lackner (2017), '*Yemen in Crisis : Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State*', London : Saqi Books, pp.40-41

৪৪ । প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ৪০-৪১

৪৫ । প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ৪০-৪১

৪৬ । প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩

৪৭ । প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

৪৮ । প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

৪৯ । প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ৫০-৫১

৫০ । প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ৫০-৫১

৫১ । দেখুন https://countryeconomy.com/gdp/yemen

৫২ । দেখুন https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-13917706/yemen-s-unemployment-crisis

৫৩ । 'Country Profile: Yemen', A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress, under an Interagency Agreement with the Department of Defense, 2006

৫৪ । দেখুন World Health Organization (2008), 'Khat Chewing in Yemen: Turning Over a New Leaf', Bulletin of the World Health Organization, vol. 86, no. 10, available at https://www.who.int/bulletin/volumes/86/10/08-011008/en/.

৫৫ । দেখুন https://reliefweb.int/map/yemen/yemen-growing-humanitarian-crisis-access-constraints-december-27-2017

৫৬ । দেখুন https://reliefweb.int/report/yemen/saving-lives-without-salaries-government-health-staff-yemen

৫৭ । Adam Haffey (2013), 'How Yemen Chew Itself Dry : Farming Qat, Wasting Water', *Foreign Affairs,* 23 July, available at https://www.foreignaffairs.com/articles/yemen/2013-07-23/how-yemen-chewed-itself-dry

৫৮ । দেখুন http://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2012/08/13/time-running-out-solution-water-crisis

৫৯ । Anthony H. Cordesman (2015), 'America, Saudi Arabia, and the Strategic Importance of Yemen', Center for Strategic and International Studies (CSIS), 26 March, available at https://www.csis.org/analysis/america-saudi-arabia-and-strategic-importance-yemen

৬০ । প্রাগুক্ত

৬১ । প্রাগুক্ত

৬২ । Martin Reardon (2015), 'Saudi Arabia, Iran and the Great Game', 26 March, available at https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/09/saudi-arabia-iran-great-game-ze-20149298484632444 0.html

৬৩ । দেখুন https://www.reuters.com/article/us-raytheon-saudi-munitions/saudi-arabia-agrees-to-buz-7-billion-in-precision-munitions-from-u-s-firms-sources-idUSKBN1DM2XC

৬৪ । Helen Lackner (2017), '*Yemen in Crisis: Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State*', London: Saqi Books

৬৫ । Rebecca Gordon (2016), 'Yet Another Undeclared U.S. War', December 11, available at http://www.tomdispatch.com/post/176220/tomgram%3A_rebecca_gordon%2C_zet_another_undeclared_u.s._war/

৬৬ । প্রাগুক্ত

৬৭ । Anthony H. Cordesman (2015), 'America, Saudi Arabia, and the Strategic Importance of Yemen', Center for Strategic and International Studies (CSIS), 26 March, available at https://www.csis.org/analysis/america-saudi-arabia-and-strategic-importance-yemen

৬৮ । প্রাগুক্ত

৬৯ । Helen Lackner (2017), 'Yemen in Crisis : Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State', London : Saqi Books, p.59

৭০ । প্রাগুক্ত

৭১ । প্রাগুক্ত

৭২ । প্রাগুক্ত